সাম্যবাদ

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● সেপ্টেম্বর ২০১৩ ● দুই টাকা

অসম চুক্তি ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে শামিল হোন

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন

২৪-২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় কমিটি-র ডাকে লংমার্চ সফল করুন

অভাব, শোষণ-বঞ্চনা, দুঃখ-দুর্দশা বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই অবমাননার মধ্যে বাস করতে করতেই কিছু বিষয়-দেশবাসীর গর্ব ও প্রেরণার অবলম্বন হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ-ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি বীরত্বপূর্ণ গণসংগ্রাম, সুন্দরবন-রয়েল বেঙ্গল টাইগার ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ তেমনই কিছু জাতিগত গৌরবের বিষয়। জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের 'টাইগার' নাম দিয়ে মানুষ আবেগ-উচ্ছাসের প্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের তালিকায় সুন্দরবনের নাম ওঠাতে বিপুল উৎসাহে তরুণরা এসএমএস পাঠিয়ে ভোট দিয়েছিলো। এটা মাত্র অল্প কয়েকদিন আগের ঘটনা। সময়ের কি নির্মম পরিহাস, এখন সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর তাদের আবাসস্থল সুন্দরবনের অস্তিত্বই হুমকির মুখে। বাগেরহাট জেলার রামপালে, সুন্দরবনের কোল-ঘেঁষে একটি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সরকারি ঘোষণায় এমন আশঙ্কাই সব দিক থেকে ঘনীভূত হয়েছে।

বিদ্যুৎ ছাড়া আধুনিক জীবন অচল। যদিও দেশের ৫৫ ভাগ মানুষ, যাদের সবাই গ্রামের গবির মানুষ, প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেই বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের কথা বলেই সুন্দরবনের পাশে স্থাপন করা হবে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। সুন্দরবনকে বলা হয় বাংলাদেশের ফুসফুস। অভাবের তাড়নায় আর মুনাফা-লোভীদের পাল্লায় পড়ে অনেক সময় গরিব মানুষ নিজের কিডনি বিক্রি করে, এসব খবর আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি। আর সুন্দরবনের পাশে পরিবেশ দূষণের জন্য সারাবিশ্ব জুড়ে লাল তালিকাভুক্ত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা কি তেমনই একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি? বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্যে আমাদের ফুসফুস বিক্রি করতে বসেছি?

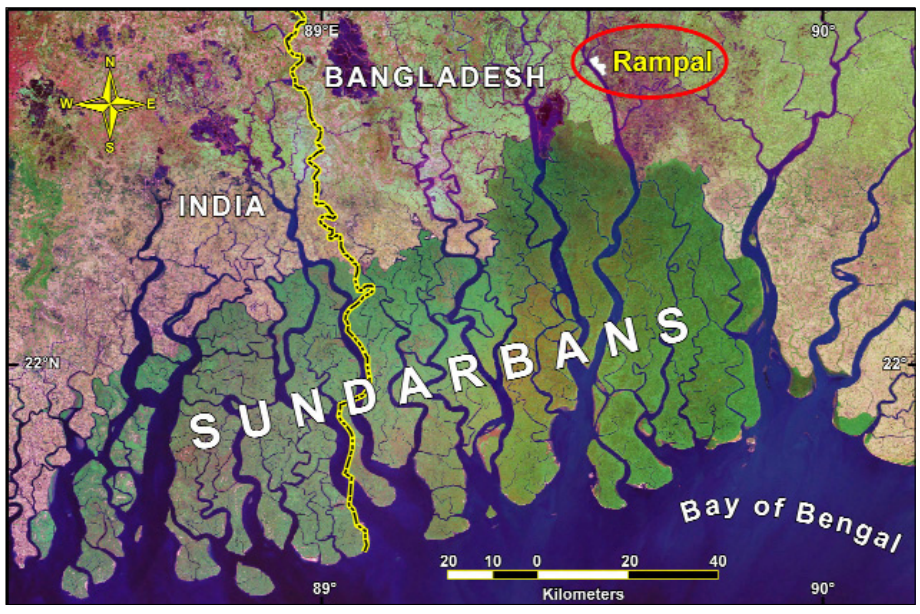

স্যাটেলাইট মানচিত্রে সুন্দরবন এবং রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বিনিয়োগে বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে মহাজোট সরকার। জায়গাটা সুন্দরবনের কাছেই, মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। জায়গাটি এক সময় সুন্দরবনেরই অংশ ছিল।

এমনিতেই কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উচ্চ মাত্রায় পরিবেশ দূষণ ঘটায়। যে কারণে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল বা কৃষিজমিতে সাধারণত কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হয় না। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, ছাই, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি আশেপাশের বায়ু, পানি, মাটিকে দূষিত করবে। এই দূষণ পানি ও বাতাসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনকে বিপন্ন করবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ কয়লা বহনকারী জাহাজ আসা-যাওয়া করবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে, যা সেখানকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলবে। ভারতীয় কোম্পানির সাথে এই চুক্তির শর্তগুলোও অসম এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী, উৎপাদিত বিদ্যুতের দামও পড়বে বেশি। স্বাভাবিকভাবেই সর্বনাশা এই প্রকল্পের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সদা সোচ্চার বাসদ, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাসহ বামপন্থী দলসমূহ, দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল দল-সংগঠন-ব্যক্তিবর্গ, ছাত্র সংগঠন, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ অনেকেই। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে আগামী ২৪-২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা-রামপাল লংমার্চের ডাক দিয়েছে। লংমার্চের মূল বক্তব্য – বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, কিন্তু সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই।

এক নজরে রামপাল প্রকল্প

২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারতীয় সহযোগিতা ও বিনিয়োগের আহ্বান জানান। সে অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১০ ভারতীয় জ্বালানি সচিবের বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি (এনটিপিসি) যৌথভাবে ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পের স্থান চূড়ান্ত হওয়ার পর ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকেই রামপালে ১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ এবং মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। সেসময় উর্বর কৃষিজমি এবং লাভজনক মৎস্য উৎপাদন এলাকা ছাড়তে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দাদের জোর করে জমি *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সরকারকে মার্কিন আগ্রাসী তৎপরতার নিন্দা জানানোর আহ্বান

সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযানের পাঁয়তারার প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযানের পাঁয়তারার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রশাসন ঠুনকো অজুহাতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। একই রকম মিথ্যা অজুহাতে ইতিপূর্বে তারা আফগানিস্তান ও ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে। সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক হামলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করে মধ্যপ্রাচ্যে 'মার্কিন-ইসরায়েলি' কর্তৃত্বকে আরো পাকাপোক্ত করা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ মার্কিন এই হামলার পায়তারাকে কোনোভাবেই বরদাসত করতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারকে মার্কিন এই আগ্রাসী তৎপরতার নিন্দা জানানোর দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ সিরিয়াসহ বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে শান্তিকামী জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ জোরদার করার আহ্বান জানান।

সিরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সামরিক আগ্রাসনের চক্রান্তের প্রতিবাদে ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাসদের বিক্ষোভ

পিএসসি'র সংশোধনী জাতীয় স্বার্থবিরোধী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরি ৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে গভীর সমুদ্রের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বিদেশী কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি(পিএসসি) ২০১২-এর সংশোধনী মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের সিদ্ধান্তে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানান এবং অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "গ্যাস-কয়লাসহ খনিজ সম্পদ নিয়ে জনস্বার্থবিরোধী পিএসসি বাতিলের দীর্ঘদিনের গণদাবিকে উপেক্ষা করে নতুনভাবে গ্যাসের ইউনিট প্রতি মূল্য ১ ডলার বৃদ্ধি, ৩০% কর্পোরেট ট্যাক্স প্রত্যাহার, কোম্পানির কস্ট রিকভারি হিসেবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ৫৫% থেকে ৭০%-এ বৃদ্ধি, কোম্পানির পাওনা গ্যাসের ৫০% তৃতীয় পক্ষের কাছে সরাসরি বিক্রির সুযোগ প্রদানসহ এ সংশোধনী অনুমোদন কার্যত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের সামিল। এ সিদ্ধান্ত আবারো প্রমাণ করলো যে, বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, এদের হাতে জাতীয় স্বার্থ কখনই নিরাপদ হতে পারে না।"

সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ ওঠে এবং জমি দখলের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনকে পুলিশ ও সরকার দলীয় ক্যাডারবাহিনী দিয়ে দমন করা হয়।

কোনো ধরনের ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়াই সুন্দরবনের মতো পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকার নিকটে বিপজ্জনক কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষকদের দায়ের করা রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইকোর্ট এই প্রকল্পের কাজ স্থগিতের নির্দেশ দেয়। ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি পিডিবি ও এনটিপিসি চুক্তির মাধ্যমে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 'বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি' গঠন করে। একটি পরিবেশবাদী সংগঠনের রীটের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে হাইকোর্ট প্রকল্প এলাকায় জলাভূমি ভরাটের কাজ কেন অবৈধ ঘোষিত হবে না তা জানতে চায়। এসকল রীট নিষ্পত্তি এখনো হয়নি, কিন্তু সরকার প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখে। ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার, পিডিবি ও এনটিপিসি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। দাম চূড়ান্ত না করেই পিডিবি ২৫ বছর ধরে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সরকারের সাথে সম্পর্কিত সংস্থা 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস' (সিইজিআইএস)-কে রামপাল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার দায়িত্ব দেয় পিডিবি। ওই সংস্থা ২০ জানুয়ারি ২০১৩ ইআইএ রিপোর্ট জমা দেয়। বিভিন্ন মহলের মতামত প্রদানের পর ১০ জুলাই চূড়ান্ত রিপোর্ট পিডিবি পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেয়। অথচ, এই রিপোর্টের ওপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে উপস্থিত বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো রিপোর্টটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে।

সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে গত ৫ আগস্ট রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। শোনা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বর মাসেই বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারেন। অবশ্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার বহু পূর্বেই মহাজোট সরকার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত করে এনেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকার জানতো তারা পরিবেশ ছাড়পত্র পাবেই, একারণে গত ৩ বছর ধরে প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ যেন বিচারের রায় পকেটে রেখে বিচার আয়োজনের মতো ব্যাপার।

সুন্দরবনের গুরুত্ব

সারা দুনিয়া জুড়ে এখন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, গ্রিন হাউজ ইফেক্ট এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ে ব্যাপক শোরগোল চলছে। জোর আওয়াজ উঠেছে, বনাঞ্চল এবং পরিবেশ রক্ষার। এর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। আমাদের দেশের সরকারও আন্তর্জাতিক ওইসব বরাদ্দের দাবি নিয়ে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। এমনই একটি সময়ে, সরকারের একটি পরিকল্পনার কারণে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আমরা কথা বলছি।

সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এ ধরনের বন সারা পৃথিবীতে বিরল। জোয়ার-ভাঁটা অধ্যুষিত সুন্দরবন বনাঞ্চল নানা জাতের গাছ-গাছালি আর জীবজন্তুর সমাহারে পরিপূর্ণ। এখানে প্রায় ৬৬ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২০০-এর অধিক প্রজাতির মাছ, ৪২ রকমের স্তন্যপায়ী, ২৩৪ ধরনের পাখি, ৫১ ধরনের সরীসৃপ, ৮ রকমের উভচর, অসংখ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী রয়েছে। বিপন্ন প্রজাতির রয়েল বেঙ্গল টাইগার, প্রায় ৭ মিটার লম্বা লোনা পানির কুমির, গাঙ্গেয় ও ইরাবতী নামের ২ প্রজাতির ডলফিন, ৩ প্রজাতির কচ্ছপের শেষ আশ্রয়স্থল এই সুন্দরবন। প্রায় ৪০০টি খাল আর ছোটবড় নদী বেষ্টিত ২০০টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের অংশে এ বনের বর্তমান বিস্তৃতি প্রায় ৪ হাজার ১১০ বর্গকিলোমিটার, যা মোট বনের প্রায় ৬০%। সুন্দরবনের বাকি ৪০ভাগ, প্রায় ২ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার অবস্থিত ভারতে। নির্বিচারে বন উজাড়ের কারণে সুন্দরবনের আয়তন দিন দিন কমছে। প্রায় ২০০ বছর আগে এই বনের আয়তন ছিল ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার।

এমনিতেই যেখানে একটি দেশের যেখানে বনভূমি থাকা উচিৎ শতকরা ২৫ ভাগ, সেখানে আমাদের আছে মাত্র ৯ ভাগ, তার বৃহত্তম অংশ হল এই সুন্দরবন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা একে বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে অভিহিত করেন। গত সিডর-আইলার প্রচণ্ড আঘাত থেকে সুন্দরবন শুধু উপকূলের জনবসতিগুলোকেই রক্ষা করেনি, সুন্দরবনের দেয়াল না থাকলে ওইসব টর্নেডো-ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে দেশের আরো বিরাট অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতো। সুন্দরবন স্থানীয় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের জীবন ও জীবিকার একমাত্র আশ্রয়ও বটে। কিন্তু এসব কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের আধার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার-সহ অসংখ্য দুর্লভ প্রাণী, উদ্ভিদের একমাত্র আধার আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া সুন্দরবনের গা-ঘেঁষে।

রামপালে প্রতিষ্ঠিতব্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৩৪ একর কৃষি, মাছ চাষ ও আবাসিক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার ৯৫ ভাগই তিন ফসলী কৃষি জমি। এ জমিতে বছরে ১,২৮৫ টন ধান ও ৫৬৯.৪১ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। এই ধান-মাছ উৎপাদন বন্ধের সাথে সাথে এখন প্রায় ৮ হাজার পরিবার উচ্ছেদ হবে যার মধ্যে উদ্বাস্তু এবং কর্মহীন হয়ে যাবে প্রায় ৭ হাজার ৫০০ পরিবার। বাংলাদেশের ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারেই প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে ৭৫ ভাগ কৃষি জমি যেখানে বছরে ৬২,৩৫৩ টন ধান এবং ১,৪০,৪৬১ টন অন্যান্য শস্য উৎপাদিত হয়। ম্যানগ্রোভ বনের সাথে এই এলাকার নদী ও খালের সংযোগ থাকায় এখানে বছরে ৫,২১৮.৬৬ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রকল্প এলাকার ফসল ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বন্ধ হবার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার উৎপাদনও নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপদ

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এমনিতেই পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। তারপরও সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। তবে পৃথিবী এখন দূষণমুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে ঝুঁকছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে প্রায় তিনশত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জার্মানিতে ৩.১ গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট আর কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ করা হবে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। এর কারণ হল, যত উন্নত প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হোক না কেন, এখন পর্যন্ত নিরাপদ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ (clean coal energy) বলে কিছু নেই। পরিবেশের ক্ষতির মানদণ্ড বিচারে এগুলো লাল তালিকাভুক্ত (red catagory)।

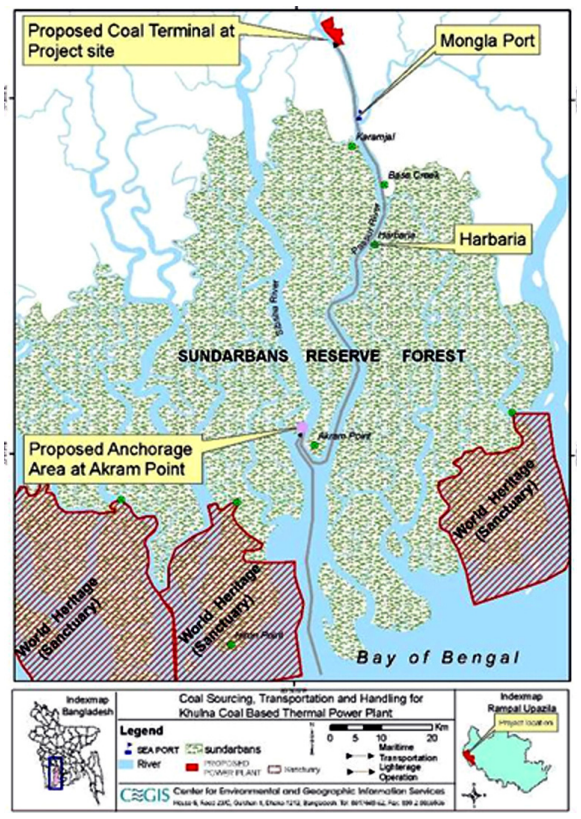

সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে নদী পথে কয়লা পরিবহন

পরিসংখ্যান দিয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহতা তুলে ধরে শেষ করা করা যাবে না। ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন করে তা শোষণ করতে প্রয়োজন প্রায় ষোল কোটি গাছের, আর রামপালে যে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে তার ক্ষমতা দুই পর্যায়ে মোট ২৬৪০ মেগাওয়াট। আপাতত ১,৩২০ মেগাওয়াটের এ বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে প্রতিদিন বিশাল পরিমাণ কয়লা পোড়াতে হবে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় ২৫০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু রাখতে প্রতিদিন কয়লা পোড়াতে হয় দুই হাজার ৪০০ মেট্রিক টন। এতে ছাই হয় প্রতিদিন ৩০০ মেট্রিক টন। এই হিসেবে রামপালে কয়লা পুড়বে প্রতিদিন ১৩ হাজার মেট্রিক টন। এতে ছাই হবে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। যত দক্ষ ও আধুনিক ব্যবস্থাপনাই করা হোক না কেন, এ বিপুল পরিমাণ ছাই ওই অঞ্চলের পরিবেশের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট হুমকির বিষয়।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, বিভিন্ন ক্ষুদ্র কণিকা, কার্বন মনো অক্সাইড, মারকারি বা পারদ, আর্সেনিক, সীসা, ক্যাডমিয়ামসহ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদান নির্গত হয়। কয়লা ধোয়ার পর পানির সঙ্গে মিশে তৈরি হয় আরেকটি বর্জ্য – কোল স্লাজ বা স্লারি (তরল কয়লা বর্জ্য)। ছাই এবং স্লারি উভয় বর্জ্যই বিষাক্ত, কারণ এতে বিষাক্ত আর্সেনিক, মার্কারি (পারদ), ক্রোমিয়াম, এমনকি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থাকে। এছাড়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের কঠিন ও তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে, কয়লা সংরক্ষণ আধার থেকে চুঁইয়ে ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও উপরিভাগের পানির সঙ্গে মিশে দূষণ ঘটায়। এর ফলে জলজ উদ্ভিদ, মাছসহ পানির অভ্যন্তরের জীবচক্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার কয়লার ধোঁয়ার সাথে ছাই উড়ে অনেকদূর পর্যন্ত যায়। এর প্রভাবে মাটি ও উদ্ভিদসমূহ নানামুখী ক্ষতির শিকার হয়। এ ছাড়াও টারবাইন, কম্প্রেসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি ও পরিবহনের যানবাহনের মাধ্যমে ব্যাপক শব্দ দূষণ ঘটে থাকে। এসব কারণেই আবাসিক এলাকা, কৃষিজমি এবং বনাঞ্চলের আশপাশে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার অনুমতি দেয়া হয় না।

অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানিকৃত কয়লা পরিবহন করা হবে সুন্দরবনের ভেতরে প্রবাহিত পশুর নদী দিয়ে। কয়লা থেকে অত্যধিক পরিমাণে কার্বন কণা নির্গত হয়, যা পরিবহনের সময় আশেপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আবার এই বিপুল পরিমাণ কয়লা জাহাজে পরিবহনের সময় যে শব্দ ও বর্জ্য উৎপন্ন করবে তা এই সুন্দরবনের নদী-নালা, খাল-বিলসহ গোটা পরিবেশকে দূষিত করবে। এর ফলে এখান জলজ প্রাণীগুলো নিশ্চিতভাবে হুমকির মধ্যে পড়বে। অনেকেই হয়তো জানেন, ২০০৭ সালে সিডর পরবর্তী সময়ে বিপর্যস্ত সুন্দরবনকে রক্ষা করতে সরকারের তরফ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মানুষের উপস্থিতিতে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের হিতে বিপরীত হতে পারে বলে পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে সেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাতিল করা হয়। যেখানে বৃক্ষরোপণের মতো কমসূচিতে সুন্দরবনের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেখানে তার ভেতর দিয়ে কয়লা পরিবহন কিভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে?

কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপে পানিকে বাষ্পীভূত করা হয় এবং সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পানির যোগান কোথা থেকে আসবে সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। ভূগর্ভ থেকে এই বিপুল পরিমাণ মিঠা পানি উত্তোলিত হলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাবে এবং সমুদ্রের পানি চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ স্তরে প্রবেশ করবে, যা এলাকায় তীব্র সুপেয় পানির সংকট তৈরি করবে এবং এখানকার কৃষি, উদ্ভিদ ও পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সরকারি ইআইএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎকেন্দ্রে শীতলীকরণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য পাশের পশুর নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৯ হাজার ১৫০ ঘনমিটার করে পানি উত্তোলন করা হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানি পরিশোধন করে ঘণ্টায় ৫ হাজার ১৫০ ঘনমিটার হারে আবার নদীতে ফেরত দেয়া হবে। এর ফলে নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় পানি উত্তোলনের পরিমাণ হবে ৪ হাজার ঘনমিটার। নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৪ হাজার মিটার পানি প্রত্যাহারের ফলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীর পলি প্রবাহ, প্লাবন, জোয়ার-ভাটা, মাছসহ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ ইত্যাদির উপর প্রভাব পড়বে। প্রকল্পে এই পানি ব্যবহারের পর তার তাপমাত্রা দাঁড়াবে ৪০-৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা পরিবেশে উন্মুক্ত করলে মাছ, ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী তো বটেই, এখানকার কৃষিও বিপন্ন হবে। এই পশুর নদীই সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

এসব সমালোচনার মুখে সরকার নতুন একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। সেটি হল, প্রকল্পের স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শেষ হওয়ার পর কয়লভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ)। স্ববিরোধিতা আর গোঁজামিলে ভরা এই রিপোর্টের অনেক জায়গায় ক্ষতিকর প্রভাবগুলো স্বীকার করেও নেয়া হয়েছে। কিন্তু তার যথাযথ সমাধান না দেখিয়ে 'হয়তো বা হবে না', 'উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে হয়তো ক্ষতি এড়ানো যাবে', 'পরে বিস্তারিত গবেষণা করা হবে' ইত্যাদি শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রিপোর্টের এক জায়গায় বলা আছে রামপাল এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যেখান থেকে নির্গত ধোঁয়া বা ছাই সুন্দরবনে 'হয়তো বা পৌঁছাবে না'। আবার এই রিপোর্টেরই আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে চুল্লী নির্গত ধোঁয়া বা ছাই সুন্দরবনে 'হয়তো বা পৌঁছাতে পারে'।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. আব্দুল-হা হারুণ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন ও এর আশেপাশের এলাকায় প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রভাব বিষয়ক একটি গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণায় পরিবেশগত প্রভাবের দিকগুলো ৩৪টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় ২৭টি ক্ষেত্রেই পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে। ৫ মে ২০১১ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডলের নেতৃত্বে পরিবেশবিদদের একটি দল প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের ২৩ ধরনের ক্ষতির হিসেব তুলে ধরেন যার সার কথা, এ প্রকল্পের ফলে সুন্দরবনের স্বাভাবিক চরিত্র বিনষ্ট হবে।

ইতোমধ্যে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন 'রামসার' সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়েছে এবং এ ঘটনায় সুন্দরবনকে নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের বন মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষর করা এক চিঠিতেও এই বিদ্যুতকেন্দ্রের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলা হয়েছে, "কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্র হলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার তথা সমগ্র জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।" চিঠিতে প্রকল্পটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়ার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে। আর ওদিকে ইন্ডিয়ান টাইমসে (২ আগস্ট '১৩) প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যাচ্ছে, রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনের বাংলাদেশি অংশ তো বটেই এমনকি ভারতীয় অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সেখানকার পরিবেশবাদী সংগঠন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অভিজ্ঞতা

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২৫ কিমি এর মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় না। ইআইএ রিপোর্ট অনুসারে প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে, যা সরকার নির্ধারিত সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিমি এনভায়রনমেন্টালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) থেকে ৪ কিমি বাইরে বলে নিরাপদ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিডিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। এতে সালফারের পরিমাণ কম থাকবে, পরিবেশ দূষণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ কেন্দ্রে আমদানিনির্ভর বিটুমিনাস কয়লা ব্যবহার করা হবে, যাতে সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড কম থাকবে। বর্তমানে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় সাব-ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। রামপালে এর চেয়ে উন্নতমানের সুপার-ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যাতে উচ্চ দক্ষতা ও কম কয়লা ব্যবহার হবে।

গত ৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে ভারতের 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়, শিরোনাম : NTPC's coal based project in MP turned down অর্থাৎ 'মধ্যপ্রদেশে এনটিপিসি'র কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প বাতিল'। খবরে বলা হয়, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কৃষিজমির উপর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রীন প্যানেল মধ্যপ্রদেশে ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন (এনটিপিসি)-এর ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়নি। কৃষিজমি, জনবসতি ও শহর নিকটে থাকা, নদীর পানি স্বল্পতা, পরিবেশগত প্রভাব ইত্যাদি নানান বিবেচনায় যে এনটিপিসি'র মধ্যপ্রদেশে *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণআন্দোলনে শামিল হোন

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয় বাতিল করে দিয়েছে, সেই এনটিপিসি-ই বাংলাদেশের সাথে কথিত যৌথ বিনিয়োগে একই রকমের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণ করতে যাচ্ছে। ভারতে এই প্রকল্পের জন্য ৭৯২ একর এক ফসলি কিংবা অনুর্বর পতিত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আর বাংলাদেশে ১৮৩৪ একর (ঐকিক নিয়মে প্রায় ২৫০ একর বেশি) জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

যে ভারতীয় এনটিপিসি বাংলাদেশে সুন্দরবনের পাশে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে সেই ভারতেরই 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশান অ্যাক্ট ১৯৭২' অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে এবং ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রণীত পরিবেশ সমীক্ষা বা আইএ গাইড লাইন ম্যানুয়াল ২০১০ অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ২৫ কিমি'র মধ্যে কোনো বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জৈববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্য কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা চলবে না। ভারতীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের 'তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন, ১৯৮৭' অনুসারেও কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিমি'র মধ্যে কোনো কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায় না। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসিকে বাংলাদেশে সুন্দরবনের যত কাছে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে দেয়া হচ্ছে, তার নিজ দেশ ভারতের আইন অনুযায়ী তা তারা করতে পারতো না! আবার সুন্দরবন থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূরত্ব আসলেই ১৪ কিমি কিনা সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে, অনেকেই বলছেন সুন্দরবন থেকে এর প্রকৃত দূরত্ব ৯ কিমি-এর বেশি নয়। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল পার্কটি বাঘ, বাইসন এবং হাতির জন্য বিখ্যাত এবং একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বনাঞ্চলটির বিস্তৃতি ৬৪৩ বর্গকিমি জুড়ে যা সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ। ২০০৭ সালে এই রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল পার্ক থেকে ২০ কিমি দূরে কর্ণাটক রাজ্যের মাইসুর জেলার চামালাপুর গ্রামে ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু, আগেও বলা হয়েছে, ভারতীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের 'তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন, ১৯৮৭' অনুসারে কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিমি'র মধ্যে কোনো কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায় না। তাছাড়া চামালাপুর গ্রামের যে দুই হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে কয়েক হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করার কথা, তাও ছিল কৃষি জমি। ফলে রাজীব গান্ধি ন্যাশনাল পার্কের ২০ কিমি'র মধ্যে কৃষিজমি নষ্ট করে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনাটি জনগণের প্রবল বিরোধিতার মুখে ভারত সরকার ২০০৮ সালে বাতিল করতে বাধ্য হয়।

মালয়েশিয়ার সাবাহ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইআইএ রিপোর্টে ২০ কিমি দূরবর্তী জীববৈচিত্র্যসম্পন্ন তাবিন অঞ্চল, ৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী তান সাংকারান মেরিন পার্ক, এমনকি ১০০ কিমি দূরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল বিবেচনায় এনে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা তা সুস্পষ্টভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছিল। অথচ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের এত কাছে থাকা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনের সম্ভাব্য ক্ষতি নীতি নির্ধারণী মহল হিসেবেই আনছে না। থাইল্যান্ডের মাই মোহ'তে ২৬২৫ মেগাওয়াটের একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। সেখানে বৃষ্টির পানিতে সালফেটের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ৫০ ভাগ বেড়ে গেছে। সালফার দূষণে জমির ফলন কমে গেছে। এসিড বৃষ্টির ফলে ওই অঞ্চলের গাছপালা মরে যাচ্ছে। চীনের সানঝি নগরী এক সময় পরিচিত ছিল ফুল ও ফলের নগরী হিসেবে। অথচ মাত্র ৩০ বছরের ব্যবধানে কয়লা দূষণে এখন তা ধূসর পাহাড় আর কালো পানির শহরে পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট ইয়ুগ্যাং গ্রোট্টি'র হাজার বছরের ঐতিহ্য হালের কয়লা দূষণে এতটাই ভঙ্গুর হয়ে গেছে যে সামান্য স্পর্শেই পাথর খসে পড়ে। তাই যতই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হোক না কেন, পরিবেশ দূষণের এর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও ঘটবে।

সুন্দরবনের পাশে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন ১৪ কিমি দূরত্বের কথা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা চলছে, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ফায়েত্তি কাউন্টিতে ১৯৭৯-'৮০ সালে ১২৩০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সময়ও স্থানীয় মানুষকে এভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছিলো। কিছু দিন পরে এর ক্ষমতা বাড়িয়ে ১৬৯০ মেগাওয়াটে উত্তীর্ণ করা হয়। ফলাফল সাথে সাথে বোঝা না গেলেও ৬৬ থেকে ১৩০ ফুট উঁচু বিশালাকৃতি পেকান গাছগুলো (কাজু বাদামের মতো একধরনের শক্ত বাদাম) যখন একে একে মরতে শুরু করলো ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের হিসেবে ফায়েত্তি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস বিশেষত সালফার ডাই অক্সাইডের বিষক্রিয়ায় পেকান, এলম, ওক সহ বিভিন্ন জাতের গাছ আক্রান্ত হয়েছে, বহু পেকান বাগান ধ্বংস হয়েছে, অন্তত ১৫ হাজার বিশালাকৃতির পেকান গাছ মরে গিয়েছে। এবং এই ক্ষতিকর প্রভাব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এমনকি ৪৮ কিমি দূরেও পৌঁছেছে। ফায়েত্তি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে গড়ে ৩০ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড নিঃসরণের ফলে সালফার ও এসিড দূষণে হাইওয়ে-২১ এর ৪৮ কিমি জুড়ে গাছপালার এই অবস্থা যদি হতে পারে তাহলে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরকারি হিসেবেই দৈনিক ১৪২ টন হারে বছরে প্রায় ৫২ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড নিঃসৃত হলে মাত্র ১৪ কিমি দূরে অবস্থিত সুন্দরবন বিপন্ন হবে।

আর আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশগত বিধি-নিষেধ মেনে চলার যেসব কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দেশে সেসব কতটুকু কার্যকর হবে তা প্রশ্নবোধক। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশগত মান নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে অনুসরণ করতে গেলে উৎপাদন খরচ বাড়বে, অর্থাৎ বিদ্যুতের দামও বাড়বে। এসব যথাযথভাবে মনিটরিং করার মতো সক্ষম ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সর্বোপরি জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত চরিত্রসম্পন্ন সরকারের অনুপস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষা করে কাজ করার প্রতিশ্রুতি কথার কথা হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশি।

এই চুক্তি অসম

এতবড় ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনকে বিপন্ন করে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে জনগণের জন্যে তা কি কোনো সুফল বয়ে আনবে? এ প্রকল্পে বিদ্যুতের দাম প্রস্তাব করা হয়েছে ইউনিট প্রতি ৮-৮.৫০ টাকা, যেখানে বর্তমানে সাধারণ গ্রাহক পর্যায়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ৪-৫ টাকা। এই প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৭০% অর্থ আসবে বিদেশি ঋণ থেকে, বাকি ৩০%-এর মধ্যে ভারত বহন করবে ১৫% আর বাংলাদেশ ১৫%। আর ওই ৭০ ভাগ ঋণের সুদ পরিশোধ এবং ঋণ পরিশোধ করার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশের। অর্থাৎ ভারতের বিনিয়োগ মাত্র ১৫ ভাগ, কিন্তু তারা মালিকানা পাবে ৫০ ভাগ। বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনায় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এনটিপিসি-র প্রাধান্য থাকবে। অথচ বাংলাদেশের বিনিয়োগ এখানে বেশি। কারণ বাংলাদেশ জমি দিচ্ছে, জনবসতি সরাতে হচ্ছে। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন হ্রাস ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি যা কিছু হবে তার সবটাই হবে বাংলাদেশের। চুক্তি অনুযায়ী কয়লা আমদানির দায়িত্বও বাংলাদেশের কাঁধে। সময়মতো কয়লা না পাওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র কিছুদিন বন্ধ থাকলে সেজন্য ক্ষতির দায়ও বহন করতে হবে বাংলাদেশকেই। বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কত হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি, আমদানিকৃত কয়লার দামের ভিত্তিতে বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৫.৯০ টাকা থেকে ৮.৮৫ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

কার স্বার্থে এই বিদ্যুৎপ্রকল্প?

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার একটি চুক্তি। দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এ ধরনের চুক্তি হতেই পারে। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের বহু স্বার্থ ভারতের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু সে-সবের ইতিহাস কি বলে? বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত কখনোই সৎ প্রতিবেশী-সুলভ আচরণ করেনি। এর বহু নমুনা আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো।

পদ্মা (গঙ্গা), তিস্তাসহ সব অভিন্ন নদীর ওপর বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার ভারত যে স্বীকার করে, তার প্রমাণ কখনো পাওয়া যায়নি। আমাদের নদীগুলো ভারতের পানি আগ্রাসনে মৃতপ্রায়। এসব বিষয় ফয়সালা না করে ভারত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর হাতে সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা চলছেই। কিশোরী ফেলানীর হত্যাকাণ্ডের বিচার, এরকম বহু ঘটনার মধ্যে একটি আলোচিত ঘটনা। দু'দেশের ছিটমহলগুলোর বিনিময়ও এখনো সম্পূর্ণ ফয়সালা হয়নি। এখন তথাকথিত 'মানবিক' কারণে বাংলাদেশ ভারতকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় খাদ্যশস্য পরিবহনে আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। ভারত থেকে কঠিন শর্তে ১০০ কোটি ডলার ঋণ নেয়া হয়েছে প্রধানত ট্রানজিটের অবকাঠামো তৈরির জন্য। আর সে কাজ করার জন্য আবার ভারত থেকেই পরিবহন ও যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বেশি দামে। সম্ভবত এরই অংশ হিসেবে 'সরকারের অগোচরে নারায়ণগঞ্জে অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সরকার'। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ৪৪ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে এর স্থাপনস্থল। এরই মধ্যে দেশটির বিদেশ মন্ত্রণালয় কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণে কারিগরি ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দরপত্রও আহ্বান করেছে।

ভারতের সাথে ট্রানজিট সংক্রান্ত আলোচনার মতো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও মহাজোট সরকার ভারতের কংগ্রেস সরকারের আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় জাতীয় স্বার্থে ছাড় দিচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না। একইভাবে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। বাংলাদেশের কয়েকজন সরকারি প্রতিনিধি হেলিকপ্টারে করে আকাশ থেকে বর্তমান টিপাইমুখ স্থল দেখে নিশ্চিত হয়েছেন : কোনো ক্ষতি হবে না! অথচ, বাংলাদেশ ও ভারতের বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন, এতে বাংলাদেশের নদীপ্রবাহে ভয়াবহ সংকট তৈরি হবে। নদীর ওপর এ ধরনের বাঁধ ও স্থাপনা যে কত ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে ভারতের উত্তরাখণ্ডে সাম্প্রতিক বিপর্যয় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে কেন বাংলাদেশ নিজের স্বার্থ আদায় করতে পারে না? কেউ কেউ বিষয়টিকে সরলভাবে দেখানোর চেষ্টা করে যে, বাংলাদেশের তুলনায় ভারত অনেক বড় একটি রাষ্ট্র। আবার অনেকেই এসব প্রশ্নের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিচারে না গিয়ে কূপমণ্ডূক সাম্প্রদায়িক ভাবধারাকে উসকে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এর মাধ্যমে তারা ভোটের রাজনীতি সুবিধা আদায় করে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যেমনি করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি লুটেরাগোষ্ঠীর নির্মম শোষণের শিকার, ভারতের সাধারণ মানুষও সে-দেশের বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, কর্পোরেট হাউজগুলোর নির্মম শোষণের শিকার। বাংলাদেশের লুটেরাদের তুলনায় ভারতের লুটেরাগোষ্ঠীর শক্তি-সামর্থ্য অনেক বেশি। এই লুটেরাগোষ্ঠী নিজেদের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আশেপাশের দেশগুলোতে হানা দেয়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক আধিপত্য বিস্তার করে। এমন সব দেশকে রাজনীতির পরিভাষায় বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ। ভারতও একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বাংলাদেশের শাসকদের জনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী নতজানু নীতিই আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে না পারার কারণ।

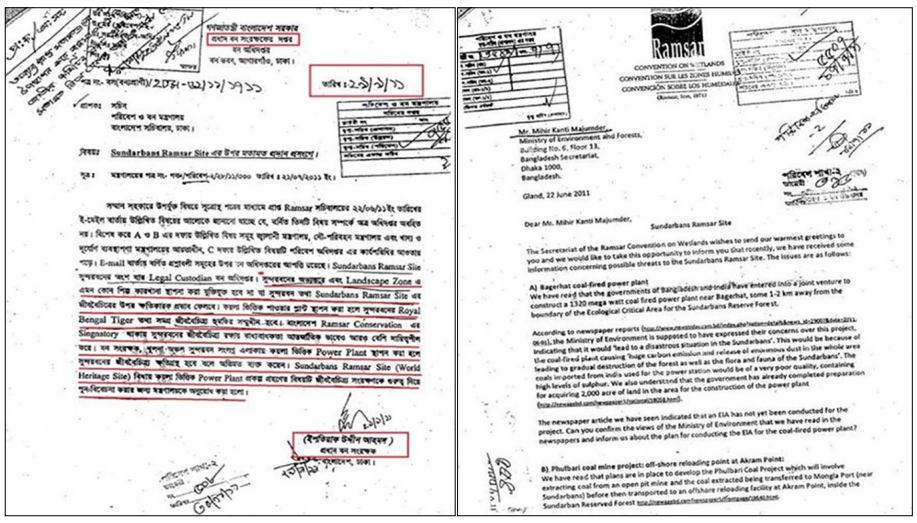

ডানে : বন অধিদপ্তরের স্পষ্ট আপত্তি, বামে : রামসার-এর উদ্বেগ

এ ঘটনা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই ঘটে, তা নয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরাগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে, সরকার বারবার দেশের জন্য সর্বনাশা পথ গ্রহণ করছে। দেশের স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্রগুলো একে একে অসম চুক্তিতে (গড়ে ৭৯ ভাগ গ্যাস ওদের আর মাত্র ২১ ভাগ আমাদের) মার্কিন-ব্রিটিশ-কানাডিয় প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানিকে ইজারা দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের নিজেদের গ্যাস ওদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক বাজার দরে বেশি দামে কিনতে হয়, যাতে প্রতি বছর আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। এসব কোম্পানি আমাদের সম্পদ লুট করতে গিয়ে কত ধরনের দুর্নীতি যে করেছে, নাইকোর দুর্নীতি মামলা তারই প্রমাণ। আমাদের শাসকরা শুধু যে গ্যাসক্ষেত্রগুলো বহুজাতিক লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছে, তাই নয়। মাগুরছড়া-টেংরাটিলার মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এরা আমাদের লক্ষ কোটি টাকার গ্যাস, বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করেছে, কিন্তু আমরা এখনো তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারিনি। ফুলবাড়ি-বড়পুকুরিয়ার উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত অব্যাহত রাখা, বঙ্গোপসাগরের গ্যাসব্লক অসম শর্তে বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দান, রেন্টাল-কুইক রেন্টালের নামে ১৪ থেকে ১৭ টাকা কিংবা তারও বেশি দরে বিদ্যুৎ ক্রয় কিংবা হালের এই ভারতীয় বিনোয়োগে সুন্দরবন-কৃষিজমি ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি সবকিছুই জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে মুনাফা ও লুটপাটের আয়োজনের অংশ।

বিদ্যুৎ সংকটের বিকল্প সমাধান

বিদ্যুৎ সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিকল্প প্রস্তাব দেশের বামপন্থী দল ও শক্তি, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দিয়ে আসছেন। গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে, পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিকায়ন করে কম্বাইন্ড সাইকেলে পরিণত করলে বর্তমানে যে পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ রয়েছে তা দিয়েই সস্তায় গোটা দেশের বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান সম্ভব। বর্তমানে ২০-২৫% সক্ষমতায় ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যাবহার করে যে ৪০০০-৪৫০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, আধুনিকায়ন করা হলে একই পরিমাণ গ্যাস থেকে ৮০০০-৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সস্তায় ইউনিট প্রতি দেড় থেকে দুই টাকা খরচে উৎপাদন করা যেত। সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেই এই লক্ষ্যে উদ্যোগ নিলে ২০১১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে পারতো। জরুরি উদ্যোগে ৬ মাসে পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত ও আধুনিকায়ন এবং দেড়-দুই বছরে নতুন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হলে কুইক রেন্টালের চেয়ে অনেক কুইক এবং অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ সংকটের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে সরকার রেন্টাল-কুইক রেন্টালের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের লুটপাটের ব্যবস্থা করেছে। বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সামিট, ওরিয়েন্টাল, দেশ, অটবি, এগ্রিকো সহ দেশি-বিদেশি কোম্পানির জন্য বিদ্যুৎ খাতকে লাভজনক করেছে আর দেশবাসীর ওপর বোঝা বাড়িয়েছে।

গত ২৪ আগস্ট সরকারি মালিকানায় একটি বৃহৎ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট) উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ মাত্র ১ টাকা ৭০ পয়সা খরচে পাওয়া যাবে বলে চার রঙা 'বিশেষ ক্রোড়পত্র'ও ছাপানো হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। প্রচলিত পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মদক্ষতা (এফিসিয়েন্সি) যেখানে মাত্র ২০-২৫% সেখানে এই কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কর্মদক্ষতা ৫৬%। অর্থাৎ সরকারি পুরাতন কিংবা বেসরকারি কুইক রেন্টালের সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রে অর্ধেক গ্যাস লাগে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা ৪১২ মেগাওয়াটের গ্যাসভিত্তিক হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদাহরণ থেকে আমরা দেখলাম, সরকারিভাবে মাত্র দুই/আড়াই বছরে বৃহৎ আকারের নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা যায়, যার সক্ষমতা পুরাতন বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে, কম গ্যাস ব্যবহার করে অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাপেক্স, পেট্রোবাংলা, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, ব্যুরো অব মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পঙ্গু করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে। হাতের কাছে থাকা এসব সমাধানের পাশাপাশি আশু এবং দীর্ঘমেয়াদী কিছু বিকল্প নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। সারা বিশ্ব এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে। কারণ তেল, গ্যাস, কয়লা এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সবই একদিন ফুরিয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই এমন জ্বালানির সন্ধান করা দরকার, যার উৎস প্রাকৃতিকভাবে অফুরন্ত। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস যেমন উইন্ডমিল, জিওথার্মাল, *(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নেশাসক্ত কিশোরীর হাতে পিতা-মাতা খুন

কারা ঐশীদের অমানুষ করছে?

এ জনারণ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু আজ আর কোন ভয়াবহ ঘটনা নয়। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনী, অপরদিকে প্রায় সবাই দরিদ্র - এরকম একটা বৈষম্যের সমাজে খেতে না পেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, দুর্ঘটনায় কিংবা সন্ত্রাস-হানাহানির বলি হয়ে মানুষের মারা যাওয়াটা কোনো বড় খবর নয়। কিন্তু কিছুদিন আগে মেয়ের হাতে পুলিশ কর্মকর্তা বাবা ও মায়ের খুনের ঘটনাটি মানুষের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পর ঐশী নামের মেয়েটি এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। ঘটনাটি চমকে দেয়ার, ঘটনাটি বেদনার। মিডিয়াতে উথাল-পাথাল হচ্ছে ঐশী কত নষ্ট ছিল তার বর্ণনা মাহাত্ম্যে। মেয়েদের দোষ বর্ণনায় এ সমাজ বরাবরই সরব। তাই ঐশীর জীবনের কৃত অথবা অকৃত সকল কর্মের মুখরোচক বর্ণনায় মিডিয়া ব্যস্ত। এতে তাদের কাটতি বাড়ছে। বুদ্ধিজীবীরা কলম ধরেছেন ঐশীদের মতো কিশোর-কিশোরীর মনস্তত্ব অন্বেষণে। আর লক্ষ লক্ষ বাবা-মা চরম আশঙ্কায় তার সন্তানের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। এমন হবে না তো তার ছেলে-মেয়ের পরিণতি?

এই পিতা-মাতারা তাদের সন্তানকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। সারাদিনের পরিশ্রম, সারাজীবনের অর্জন দিয়ে তারা তাদের সন্তানদের বড় করতে চান। তাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন কেন হচ্ছে? কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা অপরাধী হচ্ছে, নেশাসক্ত হচ্ছে, জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। কি তাদের অভাব? কেন তারা এরকম করে? এসব নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু থামানো যাচ্ছে না কিছুতেই। এধরণের খুনের ঘটনা এদেশে এখনো বিরল। যদিও ইউরোপ-আমেরিকায় এরকম ঘটনা কদিন পর পরই ঘটছে। সেখানে বাবা-মা কেন, পরিবারের সকল সদস্যদের খুন এমনকি স্কুলে ঢুকে কিংবা রাস্তায় এলোপাথারি গুলি ছুড়ে খুন করার ঘটনাও ঘটছে অহরহ। এর পেছনে মনস্তত্ব ঘেঁটে 'সাইকো থেরাপী' দিয়েও কোন ফল আসছে না।

কিশোর-কিশোরীদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষের মন বা মননকাঠামো তার একান্তই নিজস্ব বায়বীয় কোনো বিষয় নয়। সমাজের মধ্যে থেকে, বাস্তব পরিবেশের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনা তৈরি হয়। সমাজকে দেখে সে শেখে। সমাজচিন্তা তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচিন্তা হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাই এ ঘটনার কারণ খুঁজতে হবে সমাজের মধ্যেই। আর সমাধান প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর মধ্যে আলাদাভাবে খুঁজে লাভ নেই। সামাজিক কারণকে নির্মূল করতে পারলে গোটা প্রক্রিয়াকেই বন্ধ করা যাবে।

কি সেই কারণ? কি জন্য আজ কিশোর-তরুণদের মন বোঝা যাচ্ছে না? কি ঘটছে তাদের মনে?

এ সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ। এখানে লাভের জন্য সব কিছু হয়। লাভের জন্য এখানে শুধু মানুষ হত্যাই হয় না, মনকেও আজ হত্যা করে এই পুঁজিপতিরা, তাদের দোসর সমাজপতিরা। কারণ, তাহলে মানুষকে লুট করে তারা যে সম্পদের পাহাড় জড়ো করছে তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি হবে না। তারা জানে নিঃস্ব, রিক্ত, বলহীন মানুষও লড়াই করতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কিন্ত মনুষ্যত্ব-মানবতাহীন, নীতিহীন মানুষ পারে না। তাই তারা জীবনের শুরুতেই মানুষের এ মনকে মেরে দিতে চায়। তার মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ বন্ধ করে দিতে চায়।

সেই মনকে মারার জন্য আজ কত আয়োজন। হাজার হাজার কোটি টাকার নেশাদ্রব্য আসছে দেশে। শুধু ইয়াবাই ঢাকা শহরে প্রতিদিন বিক্রি হয় ৭ কোটি টাকার। হরেক রকম নেশাদ্রব্য আর পর্ণোগ্রাফীতে বাজার ছেয়ে গেছে। ঢাকা শহরে পর্ণো ব্যবহারকারীদের ৭০ ভাগই স্কুলে পড়ুয়া ছেলেমেয়ে। পুঁজিবাদ শেখাচ্ছে – জীবনকে উপভোগ কর, ফূর্তি কর। জীবন আর ক'দিনের, এর মধ্যে যত পার ভোগ করে যাও। নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে তারই প্রচার চলছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য, গান তৈরি হচ্ছে। ভোগের এই বাঁধভাঙ্গা জোয়ার আজ রুখবে কে?

তাই নৈতিকতা-মনুষ্যত্বে আজ ভাটার টান। রাস্তায় ভিখারীকে দেখে চোখের জল ফেলা আজ শিশুদের কাছে দুর্বলতা। বাবা-মা শেখাচ্ছেন,'নিজের চরকায় তেল দাও। কাউকে সাহায্য করার দরকার নেই। নিজেরটা দেখ। ফার্স্ট হও। সবাইকে ছাড়িয়ে যাও। পেছনে তাকিও না।' এই শিশুরা বড় হয়ে নিজেরটাই দেখে। বাবা-মাকেও দেখে না। কিন্তু নিজেরটা দেখার যে দর্শন আজ গোটা সমাজকে আচ্ছন্ন করে আছে তার ফল কি? ফল হচ্ছে ঐশীর মতো মেয়েরা। যে বয়সে কিশোর-কিশোরীদের খেলার মাঠে দাপিয়ে বেড়াবার কথা, হাসির ছটায় আনন্দের বান বইয়ে দেবার কথা - সেই বয়সে তারা আজ মাদকাসক্ত। তারা আজ খুনী। রবি ঠাকুরের 'বীরপুরুষ' এর বীর খোকা আজ আর নেই। 'খুকি ও কাঠবিড়ালী' এর অবুঝ খুকিও আর নেই। আজ সে মা-বাবা হত্যাকারী ঐশী। এই হল এ সমাজের আসল চেহারা।

সারা দুনিয়ায় আজ ব্যবসাতে মন্দা। পুঁজিবাদের আজ মরণাপন্ন দশা। কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিনবে কে? যাদের শোষণ করে এই বিপুল সম্পদ, এই মিল-কারখানা - তারাই তো আবার ক্রেতা। কিন্তু তারা তো আজ নিঃস্ব। এখন বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ কি দিয়ে ঠেকাবে? চাকরির বাজারে আসা বেকারদের ঢল কিভাবে সামলাবে? সামলাবে নেশা দিয়ে। তাই আজ মাদক ছড়িয়ে দাও। ভোগের দর্শন প্রচার কর। নিজেরটা দেখার দর্শন প্রচার কর। তাহলে বঞ্চিতেরা নিজেরা লড়াই করতে পারবে না শুধু নয়, কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবে না। এই কারণে আজ আর কিশোর-যুবকদের সুস্থ থাকার উপায় নেই। ভয়াবহ অন্যায়েও তাই কোন প্রতিরোধ নেই।

মাদকাসক্ত হয়ে টাকার জন্য বাবা-মাকে ব্যস্ত করত ঐশী। আর বাবা-মা তাকে পরামর্শ দিতেন লেখাপড়া করতে, নিজেরটা দেখতে। একদিকে ভোগের দর্শন, অন্যদিকে নিজেরটা দেখার দর্শন। দুটোই পুঁজিবাদের তৈরি। কারণ ঐশীরা শুধু নয়, তাদের বাবা-মাও এ সমাজেরই মানুষ। ফলে কেউ কাউকে বোঝেনি। দুজনেই আত্মকেন্দ্রিক। এইভাবেই প্রতিদিন বলি হচ্ছে শত শত ছেলেমেয়ে।

এ পঁচে যাওয়া সমাজে কোন বাবা-মা চাইলেই তার সন্তানকে রক্ষা করতে পারবেন না। কড়া শাসনে নিজের সন্তানকে রেখে সমাজের নিয়মকে উল্টানো যাবে না। ধর্মের কঠোর অনুশাসনও পারবে না তাকে রুখতে। পারলে মাদ্রাসা শিক্ষক ধর্ষক হতেন না, সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হত না। চারপাশে এত নষ্ট চরিত্রের জন্ম হত না। কিছুদিন আগেও লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম রক্ষার জন্য পথে নামলেন। মেয়েদের উপর এত নির্যাতন, গরীবের উপর এত জুলুম - এসব দেখেও কেন ধর্মপ্রাণ ঐ লাখো মানুষ নামছেন না। আমাদের মায়েদের সম্মান রক্ষা করা কি ধর্ম নয়? গরীবের বাঁচার অধিকার কি ধর্মে নেই?

ঐশীরও বাঁচার ইচ্ছা ছিল। প্রথমে সে আত্মহত্যা করার চিন্তা করেছিল। যদিও পরে আত্মহত্যা না করে সে বাবা-মাকে হত্যা করে। তখন সে একটা সুইসাইডাল নোট লিখেছিল। সেখানে সে বলেছে, 'শুধু একটাই আফসোস থেকে গেল। জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল কোনটাই পূরণ করতে পারলাম না। এ পৃথিবীর মানুষ সবাইকে বুকের মাঝে নিয়ে যে স্বপ্নগুলো দেখেছিলাম সবই কেমন ধুয়েমুছে গেল - সবশেষ। আচ্ছা সবকিছু এমন কেন হয়ে গেল বলো তো?'

আজ শিক্ষিত সমাজ নিদ্রামগ্ন। কোনরকমে নিজেরটা চলে গেলেই হল। কোনভাবেই নিজের শান্তি ভঙ্গ করতে চান না। এই মরার দেশের মড়া শান্তি নিয়ে আমরা যারা বেঁচে আছি আমরা কি পারব ঐশীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে? ঐশীর মতো আমাদেরই কোন বোন, সন্তান যদি কোনদিন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে 'সবকিছু এমন কেন হয়ে গেল?' আমরা কি উত্তর দেব তাদের?

তাই আজ অন্যায়-অপসংস্কৃতি-মাদক এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। নির্মূল করা দরকার এদের উৎসকেও। পাশাপাশি বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া - এইসব বড় বড় মনীষীর জীবনকে সামনে আনা দরকার। উন্নত সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকের চর্চা দরকার। ধ্বংসের জীবনের উল্টোটাও যে দুনিয়ায় আছে - তাদের জানানো দরকার। ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিক জীবনাদর্শের বিপরীতে মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ ও উন্নত সমাজ গড়ার জন্য সংগ্রামের চেতনা জাগাতে পারলেই কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সমাজের পংকিলতায় গা ভাসানো ঐশীর মত কিশোর-তরুণদের মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

কাজ-খাদ্যের দাবিতে কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

ক্ষেতমজুরদের জন্য সারাবছর কাজ-খাদ্য-আর্মিরেটে রেশনের ব্যবস্থা করা, ধান-পাটসহ সকল কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, সার-তেল-বীজ-কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমানো, ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু, ভূমি অফিসে সকল প্রকার দুর্নীতি-হয়রানি বন্ধসহ ৭ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ২০ আগস্ট সারাদেশে বিক্ষোভ পালন করেছে।

রংপুর : কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ আগস্ট বেলা ১২টায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও কাচারি বাজারে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ৭ দফা দাবিতে পক্ষকালব্যাপী পীরগাছা উপজেলার দেউতি বাজারে, মিঠাপুকুর উপজেলার পাগলার হাটের মঞ্জুশ্রী স্কুলের সামনে, কাউনিয়া উপজেলার তপিকল বাজারে, সদর উপজেলার তামপাটের রগু বাজারে, পীরগাছা উপজেলার রেলস্টেশন চত্বরে কৃষক সমাবেশ-হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বগুড়া : ২০ আগস্ট কৃষক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নোয়াখালী : ১৯ আগস্ট বেলা ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল জেলা শহর মাইজদীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাউন হলে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

বাঁশখালী : চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ২০ আগস্ট ৭ দফা দাবির সাথে বন্য হাতির উপদ্রব হতে কৃষক ও ফসল জমি বাঁচাতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ইউএনও বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ আগস্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত

১৯৯৫ সালের ২৪ আগস্ট রাতে ইয়াসমিন নামের চৌদ্দ বছর বয়সের এক কর্মজীবী কিশোরী ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দিনাজপুরের দশমাইল নামক স্থানে নামে। সেখান থেকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার নাম করে টহলরত পুলিশ তাকে পিকআপে তুলে নেয়। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষাকারী এই পুলিশ সদস্যরাই তাকে গণধর্ষণ করে এবং হত্যা করে পথের পাশে ফেলে রাখে। যে কারণে ১৯৯৫ সালের ২৪ আগস্ট ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড আজো আলোচিত তা হল – এই ঘটনায় ফুঁসে উঠেছিল সারা দেশের মানুষ, দিনাজপুরে সৃষ্টি হয়েছিল এক অভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতি, পুলিশের গুলিতে ঝরে পড়েছিল সাতটি তাজা প্রাণ। আন্দোলনের চাপে প্রশাসন তিনজন আসামীর ফাঁসি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ঘরে-বাইরে নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ করা, অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা রোধ, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে ২৪ আগস্ট ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, র‍্যালি, মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা : ২৪ আগস্ট বিকাল ৩টায় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা নগর শাখার সভাপতি সুলতানা আক্তার রুবির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তাছলিমা নাজনীন সুরভীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, নাঈমা খালেদ মনিকা, তানিয়া আলম, মনি সরকার। সমাবেশ শেষে র‍্যালি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

দিনাজপুর : ২৪ আগস্ট সকাল ১১টায় দিনাজপুর প্লেসক্লাবের সামনে জেলা শাখার সভাপতি বাসন্তী মালাকারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠক রাহানুমা আক্তার রাখির পরিচালনায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২৪-২৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকা-রামপাল লংমার্চ সফল করুন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) সোলার এনার্জি ইত্যাদি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নীতিপ্রণয়ন, সমর্থনদান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এখন অত্যন্ত জরুরি। তবে এসব কিছুর জন্য দরকার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ও মুক্তাবাজার নীতির পরিবর্তন, চাই জনস্বার্থ রক্ষার উপযোগী অর্থনীতি ও সরকার।

জনগণের প্রয়োজন বনাম শাসকদের পরিকল্পনা

আধুনিক সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান বিদ্যুৎ। কিন্তু বিগত সময়গুলোতে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সংকট ক্রমেই প্রবল হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে 'বিদ্যুৎ সংকট সমাধান' নির্বাচনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে বিদ্যুৎ খাতে 'খাম্বা' বসানোর মাধ্যমে যে বিপুল লুটপাটের মচ্ছব চলেছে, দেশবাসী এখনো তা ভুলে যায়নি। বর্তমান সরকার এসে সেই লুটপাটকেই রেন্টাল-কুইক রেন্টালের গলাকাটা স্তরে উন্নীত(!) করেছে।

সরকারের গৃহীত বহুল সমালোচিত এইসব পরিকল্পনাতে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে সুন্দরবনের কোল-ঘেঁষে রামপালে প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থাও প্রশ্ন তুলেছে। রামপাল প্রশ্নে সরকার বারবার বিদ্যুৎসংকটের দিকে অংগুলি নির্দেশ করছে, বলছে রামপালে তাদের গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা। উপরের আলোচনায় আমরা সরকারের এসব যুক্তি যাচাই করে দেখেছি। ফলে দেশবাসীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন : সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি না করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বাস্তবায়ন কি আসলেই সম্ভব? দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই একথা ঠিক, কিন্তু সেটা যদি হয় সুন্দরবনের বিনিময়ে তবে কি কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

চাই গণআন্দোলন, চাই প্রতিরোধ

জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই শাসকরা বিভিন্ন উন্নয়ন পদক্ষেপের কথা বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। জনগণের প্রয়োজন পূরণের নাম করে চলে জনগণের সম্পদ লুটপাট এবং জনগণের স্বার্থ হরণ। এবারও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের কথা বলে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। এর আগে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে কথা বলে রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বা ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপন করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছে বা ভবিষ্যতে আরও কিছু বাড়বে – একথা ঠিক। কিন্তু বিদ্যুতের দাম বেড়েছে তারও বেশী। জনগণের শ্রমে-ঘামে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে দিতে হচ্ছে রেন্টাল-কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে। জনগণের পকেট থেকে দুইভাবে লুটপাট চলছে – একবার ভর্তুকি দেয়ার নামে, আরেকবার অধিক দামের বিদ্যুৎ কেনার মাধ্যমে। শুধু এক বিদ্যুৎ খাতেই কি ভয়াবহ লুটের শিকার হচ্ছে দেশবাসী! আসলে বিদ্যুৎ শুধু নয়, জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ মানুষ নির্মম শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

তাহলে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বাংলাদেশের ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া, প্রতিরোধের শক্তি নির্মাণ করা ছাড়া শাসকদের এসব গণবিরোধী পদক্ষেপ, লুটতরাজ প্রতিরোধের কোনো বিকল্প পথ নেই। বামপন্থী দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি সুন্দরবন ধ্বংসের এই ভয়াবহ চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। এরই অংশ হিসেবে আগামী ২৪-২৮ সেপ্টেম্বর '১৩ অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা-রামপাল লংমার্চ। লংমার্চ-সহ জাতীয় সম্পদ গ্যাস-কয়লা-বিদ্যুৎ-বন্দর, সুন্দরবন, আমাদের কৃষি জমি ও পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলুন। আওয়ামী লীগ-বিএনপি ও তাদের সহযোগী জাতীয় পার্টি-জামাতের লুটপাটের রাজনীতির বিপরীতে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের ধারায় জনগণের পক্ষের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি, সমাজ পরিবর্তনের শক্তি গড়ে তোলার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com